

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কীর্তন গান : ইতিহাস ও স্বরূপবৈশিষ্ট্য

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হৈমন্তী চক্রবর্তী
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.11
Pages	১৬৩-১৭০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কীর্তন গান : ইতিহাস ও স্বরূপবৈশিষ্ট্য

হৈমন্তী চক্রবর্তী*

সার-সংক্ষেপ : কীর্তন বাংলা সঙ্গীতের ধারায় এক অনন্য গীতশৈলী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন ও ঈশ্বরপ্রেমের বিকাশ এর মূল উপজীব্য। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত হতে কীর্তনের উদ্ভব হলেও, বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সুরসমৃদ্ধ ও রসভাবসম্পন্ন হয়ে সঙ্গীতের ধারায় এর বিকাশ ঘটেছে। উত্তরকালে বাংলাগানের ধারায় কীর্তনের রূপকার ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। মূলত কীর্তন হলো প্রেম, ভক্তি ও সমর্পণের মিলিত রূপ। বর্তমান প্রবন্ধে কীর্তন গানের উৎস, ধারা ও এর রসমাধুর্য বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে।

'কীর্তন' শব্দটি ভক্তি ও সমর্পণের এক মিলিত উপলব্ধি। ঈশ্বর বা মহামানবের যশ বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। কীর্তন সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি মূল্যবান এবং অত্যুজ্জ্বল শাখা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব প্রণীত *সঙ্গীত রত্নাকর* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে– 'মঙ্গল, চর্যা, পাঁচালি, ঝুমুরের মতো কীর্তনও ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত হতে উদ্ভূত। মানব সভ্যতার সূষ্টিলগ্নে বৈদিক ঋষিদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গাওয়া সামগান থেকেই কীর্তনের বীজ রোপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুরসমৃদ্ধ ও রসভাবসম্পন্ন হয়ে সঙ্গীতের ধারায় প্রচলিত ও প্রসারিত হয়েছে। কীর্তন যদি মহামানবের যশোগাথার পর্যায়ে পড়ে তবে আমরা বলতে পারি, আনুমানিক ৪০০/২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কুশ ও লবের কণ্ঠে রাজা রামের যে যশোগাথা পরিবেশিত হয়েছিল তা কীর্তনেরই পর্যায়ভুক্ত। আধুনিক কীর্তনের মতো 'কীর্তিলহরী' বা 'কীর্তিপূর্ব্বিকা লহরী' প্রবন্ধ গান ঈশ্বরের বা মহাপুরুষের গুণকীর্তন বিষয়ক সঙ্গীত।' *(দেবব্রত, ১৯৯৫ : ৩৫২)* সুতরাং অনুমান করা যায় যে, 'কীর্তিলহরী' প্রবন্ধ থেকে কালক্রমে কীর্তনের উদ্ভব হয়েছে। বস্তুত, কীর্তন হচ্ছে নিবদ্ধ ধরনের একটি প্রবন্ধগীতি এবং এটি ছন্দ, তাল, লয়, রাগ ও ভাবসমৃদ্ধ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বা লীলা নামকীর্তনের মাধ্যমে প্রচার করতেন। পরবর্তীকালে নরোত্তম দাশ ধ্রুপদাঙ্গে রাস বা লীলাকীর্তন প্রচলন করেন। সনাতন গোস্বামীর উক্তিতে পাই, "সংকীর্তনম্ নামোচ্চরনম্ গীতম্ স্তুতিশ্চ নামময়ি" (মীনাক্ষী, ২০১৩ : ৫৮)। অর্থাৎ, কীর্তন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান বিষ্ণুর লীলা ও স্তুতি বিষয়ক এক প্রকার ভক্তিগীতি।

*এম. ফিল. গবেষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলায় কীর্তন গান শ্রীচৈতন্যের সময় থেকেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে তার সভাকবি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য *গীতগোবিন্দ* রচনা করেন। এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রেম, বৃন্দাবন লীলার মিলন-বিরহ ব্যঞ্জনাময় পটভূমিতে অপরূপ রূপে বিচ্ছুরিত হয়েছে। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন, "The Gitgovinda Contains soft and fluid syllabic scheme of continuous sweet narrative and poetic forms and soothing matters that charm all lovers of poetry and music" (দেবব্রত, ১৯৯৫ : ৩৫৪)।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* এবং বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের* মধ্য দিয়ে বাংলা সঙ্গীতের ধারায় কীর্তনরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এ ধারার গানে শাস্ত্রের অনুশাসন ও সুরের বিচক্ষণতার চেয়ে অধিক প্রকাশ পায় গভীর হৃদয়াবেগ। এরই ফলে বাংলা গানে কীর্তন এক স্বতন্ত্র জায়গা অধিকার করে রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব, গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি এ কাব্যের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মনের মাধুরী দিয়ে নাম গান বা সংকীর্তন বা কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য গান ও তাঁর স্বীয় ভাবাদর্শে কৃষ্ণভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করেন।

নৃত্য-গীতাভিনয় সহযোগে গাওয়া গান মূলত সংকীর্তন নামে পরিচিত। আমরা আরও বলতে পারি, সম্মিলিত প্রয়াসে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উৎসবের আঙ্গিকে যা গাওয়া হয় তা-ই সংকীর্তন। কীর্তন হলো রাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন ও সাধনকর্মের অনিবার্য অঙ্গ। কীর্তনের উৎস সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য হলো, "গৃহস্থাশ্রমে শ্রীচৈতন্য কীর্তন শুরু করেছিলেন প্রকাশ্যে। তারপর নিভৃতে শ্রীবাসের ঘরে। অর্ধপদ, অথবা পুরো একটি পদ যন্ত্রসংযোগে গাওয়া হতো। শ্রীচৈতন্য নিজে যে সংকীর্তন ব্যবস্থা করতেন তাকে বলা যায় নৃত্যকীর্তন। মহাপ্রভু সংকীর্তনে নাচতেন এবং কোনো কোনো সময় ধুয়া পদগান গাইতেন। নাচের প্রকার ছিল দুরকম– উদ্দণ্ড ও মধুর। ধুয়া গান গাইতেন– মূল গায়েন হিসেবে নয় পালি গায়েন হিসেবে মধুর নৃত্যের সঙ্গে। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'মহাসংকীর্তন' হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বৎসরের রথযাত্রায়। ... জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করে মহাপ্রভু অনেকবার সংকীর্তন করেছিলেন তা 'বেড়াকীর্তন' নামে উল্লিখিত।" (*পথরেখা* : ১৪২১ বৈশাখ : ৩১০) শ্রীচৈতন্যদেবকে নাম সংকীর্তনের স্রষ্টা মানা হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নিম্নলিখিত ছত্রে তা পরিস্ফুট–

পড়িলাম শুনিলাম এতকাল ধরি
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি
শিষ্যগণ বলেন যেমন সংকীর্তন
আপনি শিখায় প্রভু শ্রী শচীনন্দন

(বৃন্দাবন, মধ্যখণ্ড : প্রথম অধ্যায়; ১২৮)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকালে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবির পদাবলি কীর্তন হিসেবে গাওয়া হতো। তৎকালীন সময়ে 'নামসংকীর্তন', 'হরিসংকীর্তন', 'নগরকীর্তন' ইত্যাদির মধ্যে কীর্তনের পরিধি বিস্তৃত ছিল। প্রচলিত আছে, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের পুণ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমার 'খেজুরী মহোৎসবে' এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ঠাকুর নরোত্তম দাস গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তনের সাথে সাথে ধ্রুপদ গানের অবয়বের সাথে মিল রেখে পদাবলি কীর্তনের প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন গীতগোবিন্দের অন্তর্ভুক্ত রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ছাড়াও রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনি, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বৌদ্ধচর্যা ও ব্রজগীতির অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ ইত্যাদি সব নিয়েই সমৃদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত। রসকীর্তন ও লীলাকীর্তন বৈষ্ণব সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। মনে করা হয়, স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুরই লীলাকীর্তনের প্রবর্তক। চৈতন্যদেবের পূর্বে কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়নি।

অনুমান করা হয় যে, প্রবন্ধের নিয়ম অনুসরণ করেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কীর্তনের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রবন্ধ গানের ছয়টি অঙ্গ রয়েছে; যথা– স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। ভক্ত বৈষ্ণব কবি শ্রীল ঘনশ্যাম দাস তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে কীর্তনকে যেরূপে বর্ণনা করেছেন তাতে স্পষ্ট হয় যে, কীর্তন প্রবন্ধ গানের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন–

স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥
স্বর সরগ ম পব দিক নিরূপয়।
গুণ নাম যুক্ত মতে বিরুদ কহয় ॥
পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে
তেনা তেনাদিক শব্দ মংগল নিমিত্তে ॥
পাট বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা বিলঙ্গাদি।
তাল চচ্চাৎপুট যত্যাধিক যথাবিধি ॥
এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরুপয়।
বাক্য, স্বর, তান, তেন, চারি কেহ কয় ॥
(মীনাক্ষী, ২০১৩ : ৬৮)

এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, কীর্তন সঙ্গীতশাস্ত্রের নিয়মের অনুবর্তী এবং পদাবলি কীর্তনে আমরা প্রবন্ধ গানের উল্লেখ পাই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার কীর্তনের প্রচলন রয়েছে; যেমন– পদাবলি কীর্তন, পালাকীর্তন, নগরকীর্তন ও নামসংকীর্তন। তবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হচ্ছে পদাবলি কীর্তন। মধ্যযুগের বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনা ও হৃদয় অনুভূতির

প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব পদাবলির মধ্য দিয়ে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেবের কাব্যকে ভিত্তি করে ব্রজবুলি ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাস, উমাপতি ধর, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলি রচনা করেন, যা পদাবলি কীর্তন নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাগ, তাল, ভাব ও রস দ্বারা এ গানগুলো গাওয়া হতো। পদাবলি কীর্তনের উৎপত্তি হয়েছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা থেকে। বিষয়ের দিক থেকে বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলো চারভাগে বিভক্ত– (১) রাধা-কৃষ্ণ পদাবলি, (২) গৌর পদাবলি, (৩) ভজন পদাবলি এবং (৪) রাগাত্মিক পদাবলি। প্রবন্ধ গানের মতো পদাবলি কীর্তনের চারটি ধাতু, ছয়টি অঙ্গ ও পাঁচটি জাতি বর্তমান। রস ও ভাব পদাবলি কীর্তনের প্রাণস্বরূপ। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ পদাবলি কীর্তনের সমগ্র রসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ– এ দুই মূল ভাগে বিভক্ত করে আবার এ দুই ভাগে মোট ৬৪টি রসের অবতারণা করেছেন। (দেবব্রত, ১৯৯৫ : ৩৫৫)। যথা–

ক) অভিসারিকা :	১। জ্যোৎস্নাভিসারিকা	৪। দিবাভিসারিকা	৭। উন্মত্তাভিসারিকা	
	২। তামসাভিসারিকা	৫। কুজ্ঝটিকাভিসারিকা	৮। অসমঞ্জসাভিসারিকা	
	৩। বর্ষাভিসারিকা	৬। তীর্থযাত্রাভিসারিকা		
খ) বাসকসজ্জা :	১। মোহিনী	৪। মধ্যোক্তিকা	৭। সুরসা	
	২। জাগ্রতিকা	৫। সুপ্তীকা	৮। উদ্দেশা	
	৩। রোদিতা	৬। চকিতা		
গ) উৎকণ্ঠিতা :	১। দূমীত	৪। অচেতনা	৭। মুখরা	
	২। বিকলা	৫। সুখোতকণ্ঠিতা	৮। নির্বন্ধা	
	৩। স্তব্ধা	৬। মুগ্ধা		
ঘ) বিপ্রলব্ধা :	১। বিকলা	৪। বিনীতা	৭। দুত্যাদরা	
	২। প্রেমমত্তা	৫। নির্দয়া	৮। ভীতা	
	৩। ক্লেশা	৬। প্রখরা		
ঙ) খণ্ডিতা :	১। নিন্দা	৪। প্রগল্‌ভা	৭। কম্পিতা	
	২। ক্রোধা	৫। মধ্যা	৮। সন্তপ্তা	
	৩। ভয়ানকা	৬। মুগ্ধা		
চ) কলহান্তরিতা	১। আগ্রহা	৪। অধীরা	৭। মৃদুলা	
	২। মুগ্ধা	৫। কুপিতা	৮। বিধুরা	
	৩। ধীরা	৬। সমা		
ছ) প্রোষিতভর্তৃকা :	১। ভাবি	৪। দশদশা	৭। সঙ্খ্যক্তিকা	
	২। ভবন	৫। দূত-সংবাদ	৮। ভাবোল্লাসা	
	৩। ভূতা	৬। বিলাপ		
জ) স্বাধীনভর্তৃকা	১। কোপনা	৪। মধ্যা	৭। অনুকূলা	
	২। মানিনী	৫। সমুক্তিকা	৮। অভিষিক্তা	
	৩। মুগ্ধা	৬। সোল্লাসা		

পদাবলি কীর্তনের সমগ্র রস-বৈচিত্র্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার ভালোবাসা ও সমর্পণের কথায় পরিপূর্ণ। চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তন পদকর্তা হলেন নরোত্তম দাস। রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রামে আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এ উৎসবে

'গৌরচন্দ্রিকা' প্রবর্তনের সাথে সাথে ধ্রুপদ গানের অবয়বের সঙ্গে মিল রেখে পদাবলি কীর্তনের প্রবর্তন করেন নরোত্তম দাস। তার প্রদর্শিত এ কীর্তন গরানহাটী শৈলী নামে পরিচিতি পায়। গরানহাটীর পর আমরা পাই মনোহরশাহী ও রেনেটী। এ শৈলী থেকে পরবর্তীকালে মন্দারিণী এবং ঝাড়খণ্ডী প্রভৃতি শৈলীরও উদ্ভব হয়েছিল। কীর্তন গানের শৈলীগুলোর উদ্ভবের প্রকৃত ইতিহাস এখনও জানা যায় নি। মনোহরশাহী কীর্তনের উদ্ভবের মূলে দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য; তাঁরা হলেন বংশীবাদন ঠাকুর ও তার বাবা আউলিয়া মনোহর দাস। কীর্তনের বিভিন্ন শৈলীগুলি সম্বন্ধে শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, রাজশাহী জেলার গড়েরহাট পরগনায় গরানহাটীর জন্ম। রাঢ় অঞ্চলে মনোহরশাহী চালের জন্ম। গরানহাটী কীর্তনের স্রষ্টা বোধ হয় শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুর। ঠাকুর মহাশয়কেই অনেকে এ প্রণালির স্রষ্টা বলে মনে করেন। মনোহরশাহীর উদ্ভবকর্তাকে তা বলা কঠিন। মনে করা হয়, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি প্রমুখের পদাবলি থেকে মনোহরশাহী গানের উদ্ভব। (খগেন্দ্রনাথ, ১৯৪৫ : ৩২৮)

সুরবিন্যাসে গরানহাটী ও মনোহরশাহী উভয় কীর্তনই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। গরানহাটী যেমন সহজবোধ্য ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, অন্যদিকে মনোহরশাহী কারিগরি ও মাধুর্যবিশিষ্ট।

এবার কীর্তনের অবয়ব রাগ, তাল এবং সাহিত্য প্রসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। কথা, আখর, দোঁহা, ছুট ও তুক– এ পাঁচটি উপাঙ্গ নিয়ে কীর্তনের গঠন। 'কথা' বলতে সাহিত্য ও তত্ত্বকে নির্দেশ করে। এছাড়া প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ উক্তি ও প্রত্যুক্তি 'কথার' অন্তর্গত। পদাবলি কীর্তনে আখর অনেকাংশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঠুংরীতে গাওয়া 'লগ্নি' অংশের মতো। দোঁহা দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদীযুক্ত। 'ছুট' হচ্ছে কীর্তনের একটি বিশেষ অংশ, যা সমস্ত অংশের পরিবর্তে পরিবেশন করা হয়। আর 'তুক' হচ্ছে সঙ্গীতের অলঙ্কৃত রূপ। সাধারণত কীর্তনের শেষে কীর্তনকে সম্পন্ন করার জন্য রাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক গান ঝুমরা গাওয়া হয়ে থাকে। ঝুমরা ছাড়া রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা পরিবেশিত হয়। এ গৌরচন্দ্রিকা ঐশ্বরিক ভাব ও রসসমৃদ্ধ পদ। এ পদগুলোতে শ্রীচৈতন্যদেবকে রাধা-কৃষ্ণের যুগল স্বরূপে দেখা যায়। সমগ্র পদাবলি কীর্তন ১২টি তত্ত্বের সংমিশ্রণে গঠিত; যথা– (১) যুগল রূপ, (২) প্রকাশ এবং বিলাস, (৩) রসাস্বাদন, (৪) পারস্পরিক ভজনা, (৫) ভগবান-ভক্ত সম্পর্ক, (৬) সাধ্য বস্তু, (৭) সাধনা, (৮) পূর্বরাগ ও অনুরাগ, (৯) অভিসার, (১০) বাসকসজ্জা, (১১) মিলন এবং (১২) রাধা-কৃষ্ণের অভেদ সম্পর্ক।

পদাবলি কীর্তনে নায়কের চারটি রূপ– (১) ধীর ললিত, (২) ধীর শান্ত, (৩) ধীরোদ্ধত, (৪) ধীরোদাত্ত। আবার অন্যদিকে নায়িকার ৮টি প্রকারভেদ রয়েছে– (১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) বিপ্রলব্ধা, (৫) খণ্ডিতা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা, (৮) স্বাধীনভর্তৃকা। নায়িকার আবার দুটি রূপ রয়েছে– (১) স্বকীয়া

এবং (২) পরকীয়া। পরকীয়া হচ্ছে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চরম ভালোবাসার রূপ। পদাবলি কীর্তনের মূল বিষয়বস্তু হলো পরকীয়া প্রেম। পরকীয়া প্রেম দুই ভাগে বিভক্ত– কন্যা ও পরোধা। অবিবাহিত ব্রজকুমারীগণকে কন্যা এবং বিবাহিতা গোপিনীগণকে পরোধা বলা হয়। পরোধা গোপিনীগণ আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত– সাধনপরা, দেবী ও নিত্য। সাধনপরা গোপিনীগণ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– যৌতুকী ও অযৌতুকী। যৌতুকী গোপীগণের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলি, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, চিত্রা প্রমুখ অন্যতম। এদের মধ্যে রাধা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। রাধাকে বলা হতো বৃন্দাবনেশ্বরী। রাধার সখীগণ পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথাক্রমে– সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী এবং পরম শ্রেষ্ঠ সখী। কীর্তনে সখী এবং দূতীদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পদাবলি কীর্তন পরবর্তীকালে বিভিন্ন পালাগানের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, গিরি, গোবর্ধন, প্রভৃতি কীর্তনের মূলভাব গীতগোবিন্দের আধারে রচিত। পদাবলি কীর্তনের পদের শীর্ষে রাগনাম নির্দিষ্ট থাকত, যেমন– কামোদ, বরাড়ি, আশাভরি, করুণাশ্রী, রাগশ্রী, মালব, ধানশ্রী, জয়শ্রী, কানাড়া, কল্যাণ, কেদার, বিহাগড়া, কাফি, শ্রী, গান্ধার, পূরবী, সিন্ধুড়া, পটমঞ্জরী, ভাটিয়ারি, রামকেলী, ললিত ইত্যাদি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলায় ও বাঙালির জীবনে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছিল কীর্তনের মধ্য দিয়ে। এর রূপকার ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। শাস্ত্রের অনুশাসন ভেঙে, শ্রেণিবৈষম্য ভেদ করে কীর্তনকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তাই কীর্তন শুধু আরাধনার বিষয় না থেকে একটি সামাজিক মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। এ কীর্তনের মাধ্যমে বাংলায় তিনি একটি ব্যতিক্রমী ভাবান্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ড. আহমদ শরীফের কথায়, "এক কথায় বাঙালি পরোক্ষ নবজীবন চেতনা ও উদার ভাবনা লাভ করল চৈতন্য প্রসাদে। তাই ষোল শতক সর্বার্থেই অবিশেষ বাঙালি জীবনে রেনেসাঁসের যুগ" *(আহমদ, ১৯৮৩ : ৩৩)*। গঠন ও অবয়বের দিক দিয়ে কীর্তন সঙ্গীতশাস্ত্রের কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। একদল কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন, আবার অন্য দল কীর্তনকে শাস্ত্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীত বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন, কীর্তনের আদিরূপ অর্থাৎ গরানহাটী এবং মনোহরশাহীর ঢং কে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা সম্মেলক ও অনাড়ম্বরভাবে গীত হলেও আসলে কীর্তনের আঙ্গিক হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিক। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ পদের প্রতিটি অঙ্গ প্রাচীন কীর্তনে বর্তমান। এর সঙ্গে যে তাল পদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে, তাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরূপ কীর্তন প্রবন্ধ লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। তবে আখর পদ্ধতিতে কতকটা লোকসঙ্গীতের পরিচয় রয়েছে। পদাবলি বা লীলাকীর্তন তার বৈশিষ্ট্যসহ লোকসঙ্গীতের উর্ধ্বেই অবস্থিতি করে। তবে পরবর্তীকালে পালাকীর্তন প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে এসে পড়েছে, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। (মীনাক্ষী, ২০১৩ : ৬৫)

তবে একটি কথা স্পষ্ট যে, কীর্তনে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ রাগ, তালের বিষয়গুলো থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অন্তরের আবেগকে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই, কীর্তনে রাগ ও তালের ব্যবহার থাকলেও তার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্রতা। খানিকটা সংযোগ-বিয়োগ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের আবেগকে কেন্দ্রে রেখে কীর্তন রচয়িতাগণ এ সঙ্গীতধারা নির্মাণ করেছেন।

আমাদের দেশে বাংলা সঙ্গীতের সমস্ত ধারায় কীর্তনের প্রভাব লক্ষণীয়। বাউল, লোকসঙ্গীত, গণসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সহ অনেকের গানে কীর্তনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কীর্তনের যুগান্তকারী ধারায় আপ্লুত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চৈতন্যের আবির্ভাব বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মে যে একটা হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে সঙ্গীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৭ : ১২৭)

কীর্তন হলো অধ্যাত্মবাদী গান। এ গানে সংযোগ রয়েছে আধ্যাত্মিকতার। সুর ও কথায় এ গান অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শুধু ভাবসম্পদে কীর্তন ঋদ্ধ নয়। এটি কাব্যরুচিতেও অসামান্যতার পরিচয় রাখে। সাধারণ মানুষ কীর্তনকে শুধু ভগবানের আরাধনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেনি; বরং তারা আত্মার মুক্তি ও অপার্থিব জগতের সন্ধান পেতে চেয়েছেন কীর্তনের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায়, কীর্তন হলো ভক্তি ও প্রেমের এক যুগল সমন্বয়। এ গানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের গহীন থেকে বেরিয়ে আসে ঈশ্বরের প্রতি আকুলতা ও গভীর হৃদয়াবেগ। কীর্তনের এ ভক্তিরস আর প্রেমের উচ্ছ্বাসে বার বার বিমোহিত হয়েছে সঙ্গীতপিপাসু হৃদয়। কীর্তন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ কুমার রায়কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, "কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকে ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোন সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু শাখায় ও প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এ অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। ... য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুর পর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশি, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর ভঙ্গি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৭ : ১৮৪)

আমাদের দেশে পদাবলি কীর্তনের পাশাপাশি নামকীর্তনের প্রচলন রয়েছে। এখনও বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন শেষে নামকীর্তন গাওয়া হয়। 'হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হরে হরে!! হরে রাম! হরে রাম! রাম রাম! হরে হরে!! এই

কয়েকটি শব্দ অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হলো নাম জপ এবং মৌল কীর্তন। এই কয়েকটি শব্দগুচ্ছকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন সুরে চার প্রহর, আট প্রহর, ষোল প্রহর গাওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে পদাবলি কীর্তনে এক একটি পদকে বিশদভাবে বর্ণনা করে, নানা রসে, নানা অভিব্যক্তি ও অলঙ্কার প্রয়োগে সুন্দর ও মধুর রূপ ফুটিয়ে তোলেন কীর্তনীয়াগণ। একটি কীর্তনের অংশ বিশেষ–

রসকীর্তন–

মাথুর বিরহ – দূতী ভৎর্সনা

রচনা– প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস

ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া

কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।

(বঁধু তোরে ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্ হে;

এ প্রেম যে শিখাল তারেও ধিক্ হে;

তোরে ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্ হে)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া–

কে তোরে এ বুদ্ধি দিল– (উদ্ধৃত : মীনাক্ষী ২০১৩ : ৭১)

পরিশেষে বলতে পারি, শাস্ত্রীয় এবং চর্যা, পাঁচালি, ঝুমুর, কীর্তন ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের পরম্পরায়, বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কীর্তন স্ব-মহিমায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসন করে নিয়েছে। এই অনন্য গীতশৈলী বাংলার নিজস্ব সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন, সাধনা ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ– এই হচ্ছে কীর্তনের মূল উপজীব্য। তাই কীর্তন এক অসামান্য সৃষ্টি। ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস এবং অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ নিয়েই কীর্তন সমৃদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

ড. আহমদ শরীফ (১৯৮৩)। *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*. (২য় খণ্ড) নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

কৃষ্ণচন্দ্র কবিরাজ (১৯৬৩)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৩৬)। *কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

দেবব্রত দত্ত (১৯৯৫)। *সঙ্গীত তত্ত্ব* – ২য় খণ্ড (শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ); ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা

কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা (১৪২১)। *পথরেখা* (সাহিত্যপত্র)

মীনাক্ষী বিশ্বাস (অক্টোবর ২০১৩)। *পরম্পরা* (বাংলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন) সপ্তর্ষি প্রকাশনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ফাল্গুন ১৪১৩)। *সঙ্গীত চিন্তা*, নবযুগ সংস্করণ